২০১৪ নির্বাচনি ফলাফল ও বামপন্থার গতিপ্রকৃতি

মইদুল ইসলাম

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের জয় ভারতীয় রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করল। লোকসভা নির্বাচনের গত ৬২ বছরের ইতিহাসে তিনটি উল্লেখযোগ্য নির্বাচন ঘটেছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচন প্রমাণ করে যে, তখন ভারতের মতো একটি দারিদ্রক্লিষ্ট নিরক্ষর দেশে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সুচারুরূপে সম্ভব ছিল। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই দরিদ্র নিরক্ষরতাক্লিষ্ট ভারতীয় জনগণই কেন্দ্রে দোর্দণ্ডপ্রতাপ একনায়কতন্ত্রের নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেস দলকে পরাজিত করেছিল। কংগ্রেস দলকে যে কেন্দ্রে পরাজিত করা সম্ভব ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচন তা প্রমাণ করেছিল। ১৯৭৭ পরবর্তী সাঁইত্রিশ বছরে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি বিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭৭-এর পর বিগত ৩৭ বছরে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ভারত অনেকটা এগোলেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় ভারতের স্থান আজও পিছিয়ে। ১৯৯১ পরবর্তীকালে নয়া উদারবাদের রমরমা বাজারে এক নয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে গেছে। প্রায় আড়াই দশকের নয়া উদারীকরণের সময়ের মধ্যে ২০১৪ সালে আমাদের দেশে আর একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন সংঘটিত হল যেখানে এই প্রথমবার হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে দীক্ষিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ চালিত ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল।

প্রাক্-২০১৪ নির্বাচনগুলোর সঙ্গে এই নির্বাচনের ফলাফল দুটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক, ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকতার অবস্থান থেকে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুভিত্তিক রাজনীতির দিকে ঝোঁকার প্রবণতা স্পষ্ট। দুই, ভারতবর্ষে সংসদের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের অপ্রসাঙ্গিক হয়ে পড়া। অথচ এই বামপন্থীরা একটা সময়ে সংসদে কেবল প্রধান বিরোধীর ভূমিকাই পালন করত তা নয় বরং ১৯৯৬ সালে প্রবাদপ্রতিম বামপন্থী নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব পর্যন্ত এসেছিল। ভারতের সবচেয়ে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি তখন সরকারে যোগদান করেনি ঠিকই কিন্তু সংসদের ভিতরে ও বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার ভাবে সরব হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, একদশক আগে, ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বামপন্থীরা স্বাধীনতার পরে কোনো একটি নির্বাচনে সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা লাভ করে। কেবল দশ বছরের মধ্যেই তা ৮০ শতাংশ কমে গিয়ে এখনও পর্যন্ত সর্বনিম্ন আসন সংখ্যায় ঠেকে গিয়েছে (বামপন্থীদের নিরিখে)।

২০০৪ সালে বামপন্থীদের অভূতপূর্ব সাফল্য মূলত পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচনি ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সম্ভব হয়েছিল। ২০০৪-এর ৬১টি আসন বামপন্থীরা পেয়েছিল মূলত ৫টি রাজ্য থেকে (পশ্চিমবঙ্গ-৩৫, কেরল-১৮, ত্রিপুরা-২, তামিলনাড়ু-৪ ও অন্ধ্রপ্রদেশ-২)। এর মধ্যে ২০০৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে অকংগ্রেস ও অ-বিজেপি জোটসঙ্গীর ভোটের ওপর নির্ভর করেই যে বামপন্থীরা জয়লাভ করত তা ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরিস্কার। এই নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে সিপিআই ও সিপিআই(এম) মিলিতভাবে 'না' ভোটের চেয়ে কম ভোট পেয়েছে, আর অন্ধ্রপ্রদেশে দুটি বামদল সম্মিলিতভাবে 'না' ভোটের সমপরিমাণ ভোট পেয়েছে। ত্রিপুরায় বামপন্থীরা কেবল দুটি আসন ধরে রেখেছে তা নয় বরং বামপন্থীদের অভূতপূর্ব শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, ৬৪ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়ে। কেরালাতেও বামপন্থীরা ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আসনসখংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ আসন লাভ করেছে এবং বামেরা নিজেদের সমর্থন প্রায় অক্ষত রেখেছে। কেরালায় সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-এর থেকে মাত্র ১.৮৫ শতাংশ ভোটে পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ২০০৯ সালের জেতা ১৫টি আসনের জায়গায়, কেবল দুটি আসন লাভ করেছে। ভোটের সংখ্যার নিরিখে ২০০৯ সালের বামফ্রন্টের

৪৩.০ ~~৪০.৩~~ শতাংশ ভোট থেকে কমে গিয়ে ২৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৬টি লোকসভা কেন্দ্রে (আসানসোল, বহরমপুর, মালদা-দক্ষিণ, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর ও দার্জিলিং) তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। গত দশ বছরে বিভিন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে শরিকদলগুলোর জনসমর্থন কখনো বেশি কখনো কম হলেও প্রধান বাম শরিকদল সিপিআই(এম)-এর সমর্থন ধারাবাহিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। (নিম্ন সারণী দ্রষ্টব্য)

সিপিআই(এম)-এর ভোট শতাংশ হারে

সাল	২০০৪	২০০৬	২০০৯	২০১১	২০১৪
প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ	৩৮.৫৬	৩৭.১৩	৩৩.১১	৩০.০৮	২২.৭০

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামেরা ২১টি লোকসভা কেন্দ্রে ৩০ শতাংশের নীচে ভোট পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের এই অবিরত শক্তিহ্রাসের কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে গত এক দশকে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজিকে আঁকড়ে ধরে নয়া উদারবাদের যে উন্নয়নের মডেল ভারতের শাসকশ্রেণি জনসমক্ষে তুলে এনেছে তা থেকে সিপিআই(এম) নেতৃত্বের উন্নয়নের ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। স্মর্তব্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-জানা ও মার্কস কম-জানা মুখ্যমন্ত্রী মোদীর তথাকথিত গুজরাট মডেলকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই উন্নয়নের মডেল ছিল আগ্রাসী শিল্পায়ন ও নগরায়নের তড়িঘড়ি পন্থা যা গ্রাম ও শহরের একটা বড়ো অংশের মানুষকে উচ্ছেদের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। এই প্রকৃতির কর্পোরেট পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন ও নগরায়ণ চীনে ঘটেছে। চীন দেশের অসম উন্নয়নের মডেলকে মার্কসীয় তাত্ত্বিক ডেভিড হার্ভে চীনা বৈশিষ্ট্যের নয়া উদারবাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। একথা মনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও নরেন্দ্র মোদী চীনদেশে কেবল ভ্রমণ করতেই যাননি বরং সেই চীনা উন্নয়নের মডেলের ধাঁচকে অনেকাংশে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতে সিপিআই(এম) সবচেয়ে বড়ো কমিউনিস্ট দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে এবং ভারতের জনগণের মৌলিক চাহিদা ও দাবি-দাওয়ার স্বপক্ষে ও বিভিন্ন ধরনের শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে। কিন্তু যখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই(এম) চীনা কিংবা গুজরাট মডেলের দিকে ধাবিত হতে শুরু করল তবে থেকেই তার গণসমর্থন ক্রমে হ্রাস পেতে শুরু করল (বিকল্পের সন্ধানে আসলে কোনো বিকল্প ভাবনা ছিল না)।

সিএসডিএস-এর প্রখ্যাত জাতীয় নির্বাচন সমীক্ষার ফল অনুযায়ী ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় বামফ্রন্টের ৫ শতাংশ গ্রামীণ গরিব মানুষের সমর্থন কমে গিয়েছিল। উলটোদিকে, বামফ্রন্ট সরকারের নয়া উদারীকরণের দিকে প্রবণতার সময় সেই ২০০৬-এর বিধাসভা নির্বাচনে শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের ১৬ শতাংশ সমর্থন বেড়ে যায় বামফ্রন্টের পক্ষে এবং ধনীদের মধ্যে বামেদের পক্ষে ভোটের হার বাড়ে ১৮ শতাংশ। এর থেকে স্পষ্ট যে বামফ্রন্টের মূল জনভিত্তি কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির সমর্থন ২০০৬ সাল থেকেই কমতে থাকে। অন্যদিকে নয়া উদারবাদের মতন উন্নয়নের মডেলে উপকৃত হবে এই প্রত্যাশায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বামফ্রন্টের পাশে এসে দাঁড়ায়। সিএসডিএস-এর সমীক্ষায় ধরা পড়ে যে ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে বামফ্রন্টের গ্রামের জনসমর্থন আরো কমছে। ২০০৯ সালের সংস্থাটির জাতীয় নির্বাচন সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী বামেদের সমর্থন গ্রামীণ জনতার মধ্যে মূলত খেতমজুর, বর্গাদার, প্রান্তিক চাষি, অন্যান্য ক্ষুদ্র চাষি এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে। অন্যদিকে ২০০৬-এর তুলনায় ২০০৯ সালে বেতনভোগী মানুষের মধ্যে বামেদের সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। একই সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০৬ এর তুলনায় ২০০৯ সালে নগরাঞ্চলে বামেরা তাদের সমর্থন মোটামুটি ধরে রাখতে পেরেছিল। ২০১৪-র এই নির্বাচনে দেখা গেল শহরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের একাংশ যারা নাকি ২০০৬ ও ২০০৯ সালে বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল— কলকাতা, আসানসোল ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি শহরে— তারা এবার বিজেপি-কে সমর্থন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বামেদের কিছু নীতি অবলম্বন করার সময় শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির অভাব আগেই পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে শহর ও গ্রামের গরিব মানুষ ২০০৯ ও ২০১১ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূলের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সিএসডিএস-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০৬ এর তুলনায় ২০০৯ সাল থেকেই দলিত, আদিবাসী, মুসলিম ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের মধ্যে বামেদের পক্ষে সমর্থন কমতে শুরু করে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে যে সাধারণ গরিব খেটে-খাওয়া মানুষরা তৃণমূলি সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়ন সহ্য করতে পারেনি, আবার বাম নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো আশা-ভরসা ও দিশা খুঁজে পায়নি তারাও এবার বিজেপি-কে ভোট দিতে বাধ্য হয়েছে।

এ রাজ্যে বিজেপি-র বাড়-বাড়ন্ত বামগণতান্ত্রিক ও উদার ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কাছে অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। ২০০৯ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এককভাবে লড়ে মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পায়। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এ রাজ্যে মাত্র চার শতাংশ ভোট পেয়ে শূন্য হাতে

ফেরে (আসনের নিরিখে)। লক্ষ্যণীয় যে মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই নির্বাচনে বিজেপি-র জনসমর্থন এক লাফে প্রায় ১৭ শতাংশে পৌঁছয় এবং দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ থেকে একজন করে বিজেপি-র সাংসদ নির্বাচিত হন। উপরন্তু ২০১৪-তে এ রাজ্যে বিজেপি আরো তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ও তেরোটি কেন্দ্রে ২০ শতাংশের ওপর ভোট পায়। বামপন্থীরা বিজেপি-র এই উত্থানকে কতটা আগাম আঁচ করতে পেরেছিল তা জানা নেই, তবে তারা নির্বাচনি প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের বিরুদ্ধে যতটা গলা ফাটিয়েছিল ততটা কংগ্রেস ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগাতে সমর্থ হয়নি। অথচ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, বাম জননেতা জ্যোতি বসু এককালে বিজেপি ও আরএসএস-কে 'অসভ্য ও বর্বর' বলে আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হননি। তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে মতামত দেন যারা বা যে দল বাবরি মসজিদের মতো ধর্মস্থান ধ্বংস করে এবং মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের হত্যা করে, তাদেরকে অসভ্য ও বর্বর বলা ছাড়া অভিধানে অন্য কোনো শব্দ তিনি খুঁজে পাননি। আরো দ্রষ্টব্য যে, তালিবানরা আফগানিস্তানের বামিয়ানে যেভাবে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার মতো ঘৃণ্য, জঘন্য ও কুৎসিত কাজ করেছিল ঠিক একইরকম ভাবে অন্য ধর্মস্থান ও তার নান্দনিক সৌধ ও কীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তালিবানদের কুকর্মের কয়েক বছর আগেই সংঘ পরিবারের সক্রিয় কর্মীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বামপন্থীরা এই নির্বাচনে সেই সংঘপরিবার ও তার দ্বারা চালিত বিজেপি-র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শাণিত করতে পারেনি। অন্যদিকে তৃণমূলনেত্রী যিনি বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে চার-চারটি (বিধানসভা লোকসভা মিলিয়ে) নির্বাচন লড়েছেন, তিনি ৩০ জানুয়ারি ২০১৪-র বিগ্রেডের সমাবেশ থেকেই বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদী-র বিরুদ্ধে কামান দেগেছিলেন— নির্বাচন যত এগিয়ে এসেছে তাঁর সুর ততই চড়েছে। বামনেতৃত্বের একাংশের মধ্যে কোথাও যেন একটা বিশ্বাস ছিল যে, বামবিরোধী ভোট ভাগাভাগি হলে তাঁরা এই নির্বাচনি বৈতরণী পার হবেন। কিন্তু, দেখা গেল দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের মধ্যে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের বিজেপি-বিরোধী ভোটকে সংহত করতে পেরেছে। মধ্যবঙ্গে এই একই অংশের মানুষ কংগ্রেসের পক্ষে রায় দিয়েছে। তাই নির্বাচনি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বামেদের থেকে বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন অংশের মানুষ সরে গেছে ও বামপন্থীদের অবিরত সাংগঠনিক ক্ষয় হচ্ছে। জনসমর্থন হ্রাস, সাংগঠনিক দুর্বলতা কেবল বামেদের একাংশের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিচ্যুতির জন্যই হয়নি, উপরন্তু বামনেতৃত্বের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বৃহদাকারের গণআন্দোলনকে পরিচালিত করার প্রবল অনীহাও এর জন্য দায়ী। এই নির্বাচনে তৃণমূল ও বামেদের মধ্যে মূল নির্বাচনি ইস্যুগুলির ক্ষেত্রে খুব বেশি ফারাক ছিল না। যথা, অকংগ্রেস অ-বিজেপি সরকার গঠন, খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগের বিরোধিতা, পেট্রল-ডিজেল-দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ইত্যাদি। উলটো দিকে এসইজেড ও জমিনীতির ক্ষেত্রে তৃণমূল বরং বামেদের থেকে সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এমতাবস্থায় মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বামেদের কেন ভোট দেবে?

বামেদের যদি বহু মানুষের সমর্থন পেতে হত তা হলে তাদের তৃণমূলের মতো একটি মেকি বামদলের কর্তৃত্ববাদী নেত্রীর চেয়ে অনেক গ্রহণযোগ্য বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প নীতিগুলোকে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত করার লাগাতার লড়াই চালাতে হত। গত তিন বছরে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের আমলে যে বীভৎস দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসা সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, দুর্বৃত্তায়ন, নারীনির্যাতন, কৃষকের আত্মহত্যা, বেকারত্ব, বেআইনি মজুতদারদের বাড়বাড়ন্ত (যা মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক) এবং বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধির মতো মানুষের প্রাত্যহিক জ্বলন্ত কিছু সমস্যার বিষয়গুলিতে বামফ্রন্ট কোনো বড়ো রকমের সরকারবিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি। অথচ এই বামেদেরই পূর্বসূরিদের ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াই ও গণআন্দোলনের ঐতিহ্যকে বহন করে আসার ফসল হল তিন দশকের বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্টকে আজ বুঝতে হবে তারা আর সরকারের আরামকেদারায় বসে নেই। তারা বিরোধীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিরোধী হয়ে বামনেতৃত্বের লড়াই, আন্দোলন স্তিমিত করলে চলবে না। আবার লড়াই আন্দোলনের নামে কিছু আনুষ্ঠানিক দায়সারা প্রতিবাদসভা ও জন-সমাবেশ করলে বাম রাজনীতি ঘুরে দাঁড়াবে না। সর্বস্তরে পার্টি অফিসে বসে কেবল প্রেসবিবৃতি ও সাংবাদিক সম্মেলন করেও বামপন্থী রাজনীতি হয় না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই বামেদের এখন ঘামঝরিয়ে জনসংযোগ বাড়াতে হবে, তার সঙ্গে শাসকশ্রেণির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা এই মুহূর্তে বামেদের আশু কর্তব্য। রাস্তাই বাম রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের একমাত্র রাস্তা।

আরেক রকম

দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা
১-১৫ জুন ২০১৪ ১৬-৩১ জৈষ্ঠ্য ১৪২১

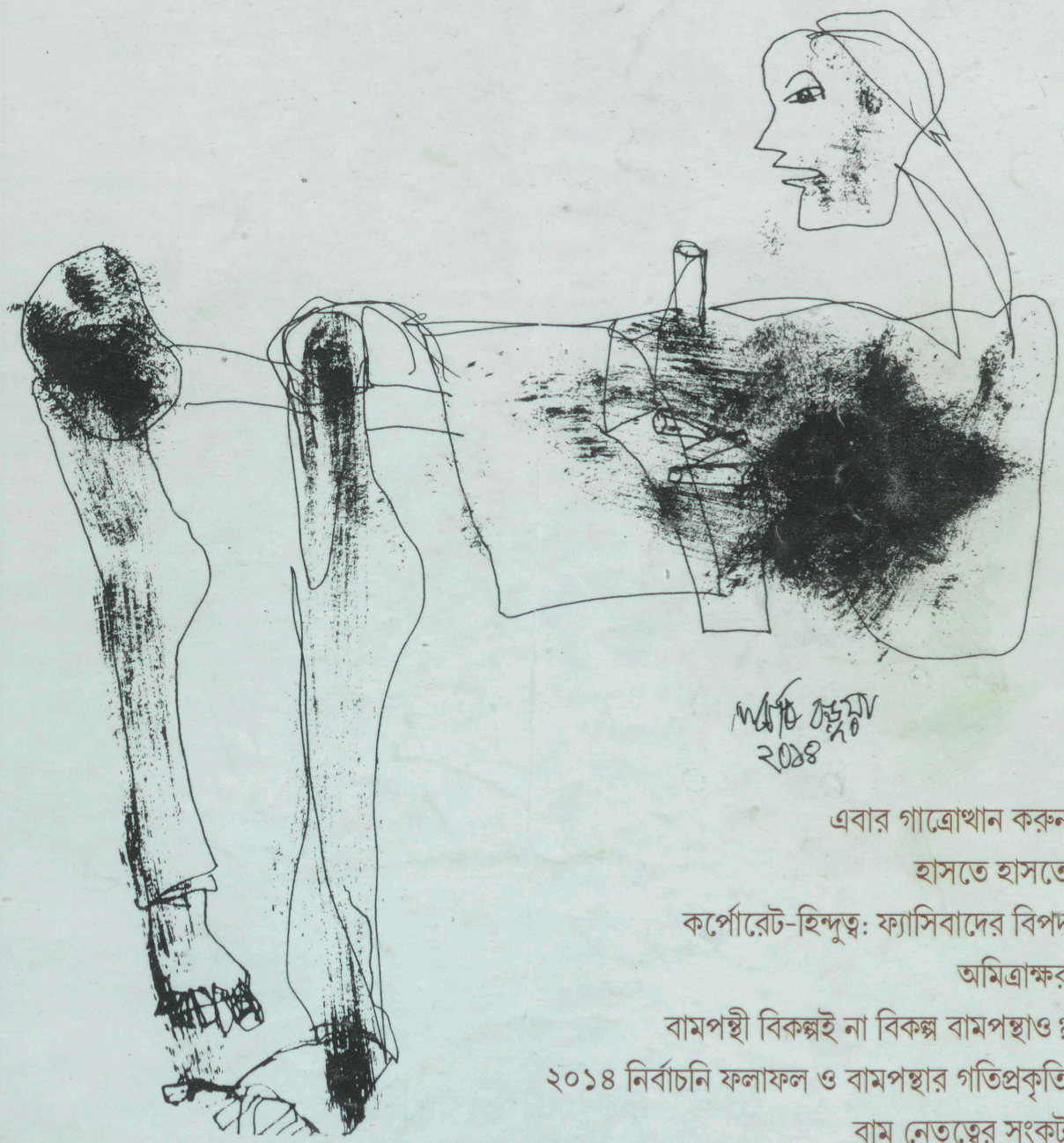

এবার গাত্রোত্থান করুন
হাসতে হাসতে
কর্পোরেট-হিন্দুত্ব: ফ্যাসিবাদের বিপদ
অমিত্রাক্ষর
বামপন্থী বিকল্পই না বিকল্প বামপন্থাও?
২০১৪ নির্বাচনি ফলাফল ও বামপন্থার গতিপ্রকৃতি
বাম নেতৃত্বের সংকট
জলবায়ু পরিবর্তন: সংশয়ীদের কেরামতি
ভুল পুরাণ, ভুল ভারত

মূল্য : ২০ টাকা